পুরুষের বেলায় *অধিকার,* নারীর বেলায় *দায়িত্ব*

তসলিমা নাসরিন

আপাদমস্তকের সব রঙ্গ-রক্ত-রস প্রাণপণে ছেঁকে, নিংড়ে, শুষে নিলে অতি শুস্ক যে কঠিন পদার্থটি পড়ে থাকে, তাকে সম্ভবত নাম দেওয়া যায় *ডকটরাল থিসিস* বা *পোস্টডকটরাল প্রজেক্ট।* শ্রীমতি অনুপমা রায়ের থিসিস বা প্রজেক্টের নাম *জেনডারড সিটিজেনশিপ, হিস্টোরিকাল এন্ড কসসেপচুয়াল এক্সপ্লোরেশন,* এবং এটিকেই তিনি বই আকারে প্রকাশ করে আমার মতো সরল সোজা পাঠককে অতিশয় অস্বস্তির মধ্যে নিশ্চিতই ছুঁড়ে দিয়েছেন। অ্যাকাডেমিক চলনবলনের দুশ মাইল দূরে থাকা আমার জন্য ঘটনাটি খানিকটা বেদনাদায়ক বটে।

বইটিতে শতসহস্র শব্দ খরচ করে যে গূঢ় কথাটি বলতে চাওয়া হচ্ছে বা বলা হচ্ছে তা হল *পুরুষেরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে মর্যাদা পায়, নারীরা তা পায় না। পায় না, কিন্তু পাওয়া উচিত।* এটি নতুন কোনও কথা নয়, সমতায় এবং সততায় বিশ্বাস করা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানষ বহুকাল ধরে বলছেন এ কথা। তবে অনুপমা রায় রাজ্যির বই পত্র ঘেঁটে মুঠো মুঠো ইতিহাস তুলে, তত্ত্ব -তথ্য- দর্শন বর্ষণ করে দেখিয়েছেন একসময় নারীর অবস্থা কোথায় ছিল, বিবর্তনে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কতটা পথ এখনও বাকি আছে বুড়ি ছোঁবার।

মেয়েদের কি কেবল এই তৃতীয় বিশ্বই ঠকাচ্ছে! প্রথম বিশ্বেও শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে কোনও ধারণা ছিল না মেয়েরা মায়ের জাতের বাইরেও একটি জাত, সে জাতের নাম মানুষ-জাত। মেয়েরা চিরকালই নগণ্য হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে, নাগরিক হিসেবে হবে কেন! নাগরিক শব্দটির উৎপত্তি নগর থেকে। একসময় এক একটি নগরই ছিল এক একটি রাষ্ট্র। ভূমধ্যসাগরের কিনারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পনেরোশ নগরই, প্লেটো মজা করে বলতেন *পুকুরের চারধারে ব্যাঙের মতো,* ছিল সেকালের গ্রীস। গ্রীসের কথাই ধরা যাক, আজ থেকে আড়াইহাজার বছর আগে প্রথম যেখানে গণতন্ত্র চালু হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রে নাগরিকের মর্যাদা পেত যারা সরকার চালাতো, রাজনীতির জ্ঞান ছড়াতো, তারাই, হাতে গোনা কিছু গণ্যমান্য লোক। নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতো বাচ্চাকাচ্চা, নারী আর ক্রীতদাস-দাসী। নাগরিকত্ব, নাগরিক অধিকার এসব ধারণার ধীরে ধীরে উত্তরণ হতে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তৃত হয়, আরও গভীর হয় নাগরিকত্বের ভাবনা। সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এটির প্রয়োজন ছিল। নাগরিক নীতিবোধ গড়ে তুলে রাষ্টের

প্রতিরক্ষায় প্রতিশ্রুত হওয়া, স্ব স্ব কর্মে, শ্রমে, শৃঙ্খলায়, দেশাত্ববোধে-প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করা ছিল নাগরিক হওয়ার শর্ত। সাম্রাজ্যের সকলেই নাগরিকত্ব পেয়ে গেল। নাগরিকত্ব কেবল মুখের কথা হয়ে রইল না, রীতিমত আইনী প্রতিষ্ঠা পেল। চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু নাগরিক হওয়া থেকে বঞ্চিত এই রোমান সাম্রাজ্যেও রয়ে গেল দুটো জাত(!), নারীজাত আর নিচুজাত।

ষোড়শ শতাব্দি থেকে এক পক্ষের কাঁধ থেকে দায়িত্ব কিছু অপরপক্ষের কাঁধেও গেল। নাগরিককে একগাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পালন করার জন্য, কিন্তু নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের কি কোনও দায়িত্ব নেই? নিশ্চয়ই থাকা উচিত, এখন থেকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নাগরিকের শারীরিক, পারিবারিক, বৈষয়িক নিরাপত্তা বিধান করা। রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব এবং নাগরিকের অধিকার বিষয়ে ফরাসি দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা সাধারণ জনগোষ্ঠীতে এমনই প্রভাব ফেলেছিল যে ফরাসি বিপ্লবের মতো বিস্ময়কর ঘটনাও একদিন ঘটে গেল। লেখা হয়ে গেল মানুষের অধিকারের আইন। ওদিকে আমেরিকার মতো নতুন দেশেও পরিবর্তনের জোয়ার উঠেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন ঘটেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমানাধিকারের সংবিধানও রচিত হয়ে গেছে, গেছে বটে, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, পুরুষতন্ত্র সবই বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছে তখন, যেসব প্রথায়, বাদে, তন্ত্রে কালো মানুষ, দরিদ্র আর নারীর কোনও অধিকার স্বীকার করা হয়নি।

পুরুষেরা এভাবেই বিশ্ব জুড়ে নিজেদের অধিকারকে *মানুষের অধিকার* বলে ঘোষণা করেছে। কোনও বিপ্লবই-কোনও সংবিধানই-কোনও আইনই নারীর পক্ষে কোনও টুঁ শব্দ করেনি। নারীকে আদৌ *মানুষ* ভাবার মন বড় বড় বরেণ্য বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরও ছিল না। পুরুষের জন্য *অধিকার* এর ব্যবস্থা হয়েছে, পুরুষের কথা বলার, ভোট দেবার, ভোটে দাঁড়াবার, ভাবার, স্বাধীনতা পাবার অধিকার। নারীর জন্য হয়েছে দায়িত্বের ব্যবস্থা । ঘরসংসার সামলানো, পুরুষকে সুখ স্বস্তি দেওয়া, সন্তান উৎপাদন করা, সন্তানাদি লালন পালন করার *দায়িত্ব।* এক শতক দুই শতক করে সময় পার হচেছ, নারীকে যে কুয়োতে ফেলে রাখা হয়েছিল, সে কুয়োতেই আছে, ওদিকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তথাকথিত গণতন্ত্রের চমক বাড়ছে, রংঢং বাড়ছে, স্বাধীনতা এবং অধিকার পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু কী আশ্চর্য, নারীর অধিকারের কথা কোনও পুরুষ বা মহাপুরুষ উচ্চারণ করছেন না। দুএকজন বলেছেন বটে, কিন্তু নারীকেই দাঁড়াতে হয়েছে শেষ অবদি, রক্ত ঝরিয়ে নারীকেই লড়তে হয়েছে নিজের অধিকার আদায় করতে। ভোটের অধিকারের জন্য দীর্ঘ বছর ধরে আন্দোলন করে তবেই সফল হয়েছে পশ্চিমের নারীরা। কিন্তু পশ্চিমের নারীর সফলতার অর্থ কিন্তু ব্যাপক অর্থে নারীর সফল হওয়া নয়। এই একবিংশ শতাব্দিতেও পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীর ভোটের অধিকার নেই। নারী এখনও রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষা স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রে ভয়ংকর বৈষম্যের শিকার। নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত।

অনুপমা রায় তাঁর বইয়ের শুরুর দিকে অনেকটা এরকমই আলোচনা করেছেন। নারীর প্রতি পুঁজিবাদী এবং মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও বিস্তর কথা আছে। এও এমন নতুন কিছু নয়। তাত্ত্বিকরা যা বলে গেছেন অতীতে, শ্রীমতি রায় মূলত সেগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। পরের পরিচ্ছদগুলোয় তিনি ভারতবর্ষকে দাঁড় করিয়েছেন কাঠগড়ায়। ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিভূরা নারীকে ঠিক কী চোখে দেখেছেন, নারীর নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার রকমই বা কী ছিল! কী ছিল? ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সংঘাত শুরু হলে ওই শক্তির ঐতিহ্যর চেয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য যে কালি-কালিমা মুক্ত, গঙ্গাজলে স্নাত, শুদ্ধ --- তা বোঝাতে ভারতীয় নারীকে আগের চেয়েও বেশি বন্দি হয়ে থাকতে হল ঘর গৃহস্থালির ক্ষুদ্র জগতে। ভারতীয় সংস্কৃতি, সে সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার সংস্কৃতি হলেও তা রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় নারীর ঘাড়েই চাপিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রচুর বইপত্র বেরিয়েছে নারীর স্থান যে ঘরে, স্থান যে বাইরে নয়, তা বোঝাতে। বাইরের জগত পুরুষের, নারীর নয়। বাইরের জগতে শক্তি সাহস দরকার, বাইরের জগত পরিশ্রমের, সংগ্রামের, বাইরের জগত যুদ্ধের, রাজনীতির, ওখানে পুরুষকে মানায়, নারীকে নয়। নারী নরম। নারী ভঙ্গুর। নারী ভীতু। নারী বুদ্ধু। *আত্মবিস্মৃতি* এবং *আত্মত্যাগ,* এ দুটো জিনিস দিয়েই নারীকে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। এ থেকে সামান্যও বিচ্যুতি চলবে না। এদিকে পুরুষের জন্য দুটো গুণ খুব প্রয়োজনীয়, *আত্ম নির্ভরতা* এবং *আত্ম গৌরব।* এ দুটো গুণ নারীর থাকলে ঘর সংসার ভেস্তে যাবে, সমাজ নষ্ট হবে, জাতির সর্বনাশ হবে।

নারীর জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা বলা হত, সে শিক্ষা আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মাতা হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা। উনিশশ বিয়াল্লিশ সালে বের হওয়া *নারীধর্ম শিক্ষা* বইটির কথা উল্লেখ করেছেন অনুপমা রায়। নিয়মশৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নম্রতা, নতজানুতা এসব শিক্ষা পই পই করে নারীকে দেওয়া হয়েছে। বইটিতে আদর্শ গৃহিনীর ছবি আছে, প্রথম নারী ঝাঁ তকতকে রান্নাঘরে বসে চরকা কাটছে, দ্বিতীয় নারী একটি গোছানো বৈঠক ঘরে বসে *নারীর কর্তব্য* নামের বই পড়ছে, তৃতীয় নারী ওই একই ঘরে একটি মাদুরের ওপর বসে একটি শিশুর সঙ্গে খেলছে। মেনে চলার জন্য নারীর উদ্দেশে কিছু নিয়ম দেওয়া আছে বইটিতে। নিয়মগুলো এরকম। ১. সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমোতে যাবার সময় ভগবানের নাম নেবে। ২. সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে, তা না করতে পারলে উপোষ কর। ৩. স্নান করে এসে সূর্যের পুজো কর। ৪. এক হাজার পাঁচশ বারো বার *হরে রাম* মন্ত্র উচ্চারণ কর। ৫. ভগবানকে প্রতি ঘন্টায় কমপক্ষে একবার করে মনে কর। ৬. বয়স্কদের পা ছুঁয়ে প্রণাম কর। ৭. কখনও ক্রোধান্বিত হবে না। ৮. ভগবানের পুজো কর। ৯. কখনও অতৃপ্তি বা অসন্তুষ্টি দেখাবে না। ১০. যদি তোমার স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের ওপর তোমার চোখ পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম নেবে। ১১. কখনও কোনও সমালোচনা করবে

না। ১২.খাওয়ানোর সময় কাউকে ঠকাবে না। ১৩. কখনও নিষ্ঠুর হয়ো না। ১৪. কখনও কৌতুক কোরো না। ১৫. কখনও অন্যের মনে কষ্ট দিও না। ১৬. সদা সত্য কথা বল। ১৭. কখনও কিছু লুকিয়ো না। ১৮. যদি তুমি নিয়ম ভঙ্গ কর, তবে একশ আটবার *হরে রাম* মন্ত্র জপো। ----- ঘোর জাতীয়তাবাদী-ধার্মিক-পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ থেকেই এই আদেশ । ভগবান-সেবায়, স্বামী-সেবায়, সংসার-সেবায় যেন মগ্ন হয় নারীকূল। ভারতীয় নারীকে হতে হবে ভারতীয় আদর্শের প্রতীক, কিন্তু ভারতের পূর্ণ নাগরিকত্ব পাবার যোগ্যতা তাদের থাকবে না। ভারতের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে প্রতিহত করা হবে। ঘটনা তো তাই ঘটেছে, ঘটিয়েছে পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষেরা, জ্ঞানে গুণে তারাই তখন সর্বেসর্বা। শাসকের ভাষা ও সংস্কৃতির পাঠ নিয়ে শাসকের তন্ত্র মন্ত্র শিখে শাসককেই আক্রমণ করেছে। ভালো কথা, কিন্তু কোথায় তারা সমতা আর সাম্যের স্বপ্ন নিয়ে অন্তঃপুর থেকে নারীকে উদ্ধার করবে, তা নয়ত করেছে উল্টোটি।

উনিশশ সতেরো থেকে উনিশশ চল্লিশ অবদি ভারতে নারীর ভোটের অধিকার নিয়ে, অনুপমা রায় জানাচ্ছেন, ইওরোপ আমেরিকায় যে রকম আন্দোলন হয়েছিল, তা না হলেও, মৃদুকণ্ঠে তর্ক বিতর্ক চলেছে। ভোটের অধিকার একজন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার, অথচ তার এই অধিকারকে অস্বীকার করেছে ভারতীয় হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মেরই জাতীয়তাবাদি নেতৃবৃন্দ। নারী ভোটের অধিকার পেলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে, পর্দাপ্রথার ক্ষতি হবে। সে কি ভয়ার্ত চিৎকার ভারতবর্ষ জুড়ে! নারীত্ব আর নাগরিকত্ব এ দুটোর মিলন কিছুতেই নাকি হতে পারে না।

নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন, নাকি প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার, কোনটা চাই? নারীদের একদল এই পক্ষে তো আরেক দল আরেক পক্ষে। তিরিশ দশকের গোড়ার দিকটায় এ-ই ঘটে। ভারতের রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক চলে এ নিয়ে দীর্ঘদিন। ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগ পর্যন্ত ভারতীয় নারীবাদীরা ইংরেজ এবং আইরিশ নারীবাদীদের সঙ্গে একজোট হয়ে ভোটের দাবির জন্য মুখ খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু কোনও আন্দোলন শুরু হতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর সমানাধিকারের প্রসঙ্গ উবে গেল জাতীয়তাবাদের হাওয়ায়, সবার আগে তখন স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার সাধ। নারীকে দাসি বাঁদি ভাবার প্রাচীন পুরোনো পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ তখন জাতীয়তাবাদী চেতনার খোরাক। নারীসংস্থা-সংগঠন যদিও ছিল বেশ কিছু, সকলে, বুঝে না বুঝে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গেল। ভোটের প্রশ্ন উঠলে সরোজিনী নাইডু, বেগম শাহ নেওয়াজ, রাধাবাই সুব্বারিয়ান সকলে মিনমিন করে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, *নারীরা সংসারধর্ম ঠিক ঠিক পালন করেও রাজনৈতিক অঙ্গনে পা ফেলতে পারে, ভোট দিতে পারে। এতে নারীর নারীত্ব, সতীত্ব কিছুই খোয়া যাবে না। রাজনৈতিক সচেতনতা এলে নিজের সন্তানকেও আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।* নারীনেত্রীরা, কারও যেন কোনও ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে, বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা নারীবাদী নন। তাঁরা পশ্চিমের

নারীদের মতো *লিঙ্গযুদ্ধ* চাচ্ছেন না। তাছাড়া, নারীবাদী আন্দোলনের কোনও প্রয়োজন ভারতবর্ষে নেই। কারণ এখানে যে কোনও কাজেই পুরুষ নারী পরস্পরকে সহযোগিতা করেই অভ্যস্ত। কিছু উচ্চ-মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, সচ্ছল, সুযোগ সুবিধে পাওয়া নারী কী ভয়ংকরভাবেই না ভুলেই গিয়েছিলেন দেশের অধিকাংশ নারীর কথা, অধিকাংশ যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিরক্ষর, নির্যাতিত, অবহেলিত এবং অসম্মানিত। ভারত স্বাধীনতা পেল, বিভক্ত হল দেশ, বিভক্ত হয়ে গেল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ রেখে দাঁড়ানো নারী। নারীরা এখন আর নারী নয়, তারা কেউ সংখ্যাগুরু, কেউ সংখ্যালঘু। তারা এখন ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় টিকিয়ে রাখার যন্ত্র। নারী-স্বাধীনতার যে আন্দোলনটি ভারতবর্ষে হতে পারতো, তার বড় করুণ মৃত্যু হল। ভারতীয় সংবিধান জোর দিয়েছে ধর্মের স্বাধীনতার। আর এই সুযোগে অশিক্ষিত অসহিষ্ণু মুসলমান-পুরুষেরা মুসলমান-নারীদের ভারতীয় গণতন্ত্রের মানবাধিকার, নিরাপত্তা আর ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য করছে। শাহবানু মামলাতে দেখা গেছে এ ক্ষেত্রে মদত দিচ্ছে সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী সাম্প্রদায়িক রাজশক্তি।

উনিশশ চৌত্রিশ সালে সর্ব ভারতীয় নারী-সভায় দাবি উঠেছিল সমতার আইনের, উত্তরাধিকার, বিবাহ,এবং সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার দাবি, সেদিনের সেই দাবি আজও দাবি হিসেবেই রয়ে গেল। অবশ্য এই দাবি এখন অনেকটা অচ্ছুতের মতো। মুসলিম পারিবারিক আইনের সংস্কার বা এর বিলুপ্তি নিয়ে কথা উঠলেই হিন্দু মৌলবাদী দলের সমর্থক হিসেবে দুর্নাম কামাতে হবে, এই ভয় তথাকথিত সেকুলার নারী-পুরুষেরও। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, যে বিধিতে নারী পুরুষের মধ্যে সমতার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়, সেই বিধি কি গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত নয়! *ধর্মীয় আইন* যদি মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, তবে সেই *আইন* অক্ষত রেখে কার কী লাভ করছে ভারতবর্ষ? ধর্ম তো ক্ষণে ক্ষণে দেশটিকে ছোবল দিচ্ছে, তবু ধর্মকে দুধকলা খাইয়ে বড় করার অদম্য আকর্ষণ দূর হয় না অদূরদর্শী ধুরন্দর রাজনীতিবদদের!

হিন্দু আইনে নারী পুরুষের বৈষম্য ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু মুসলিম আইনে নারীর অধিকার এখনও বড় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। শাস্ত্র অনুসরণ করে পারিবারিক আইন তৈরি হয় যে রাষ্ট্রে, সে রাষ্ট্রকে সেকুলার বলি কী করে! সম্প্রদায় ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি বিধি থাকে, কী করে তবে সেই রাষ্ট্রকে অসাম্প্রদায়িক বলি! নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত নয় যে রাষ্টে, সেই রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র বলি কী করে!

অনুপমা রায় বলছেন , যে, সতীদাহ, মুসলিম পারিবারিক আইন, এবং আরও অনেক লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের নারীরা দীর্ঘ দীর্ঘকাল আন্দোলন করেছেন। এ বিষয়ে আমার দ্বিমত আছে। ভারতবর্ষে সত্যিকার অর্থে, আমার বিশ্বাস, কোনও শক্তিশালী নারীবাদী আন্দোলন ছিল না, এ যাবৎ নারীর পক্ষে যা কিছুই হয়েছে, হয়েছে সমাজসংস্কারক শিক্ষিত পুরুষ দ্বারা। অশিক্ষার অন্ধকারে সংসারখাঁচায় বন্দি করে রাখার

পুরুষতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের শিকার নারী, এই নারী তার অধিকারের ব্যাপারে অচেতন, এই নারী স্বাধীনতার স-ও জানে না।

লেখক আশা করছেন বিশ্বায়নের যুগে মানবাধিকারের বোধ প্রসারিত হতে হতে মানুষকে এমনই অধিকার সচেতন করবে যে ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হবে না ধর্ম আর সংস্কৃতি রক্ষার নামে মানুষকে অশ্রদ্ধা করা, অপমান করা। আসলে, সে সংস্কৃতির কোনও দেশে কোনও সমাজে সংস্কৃতি হিসেবে সম্মান পাওয়া উচিত নয়, যে সংস্কৃতি মানুষের মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীনতার ক্ষতির কারণ হয়, যে সংস্কৃতি নির্মমভাবে মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষের কল্যাণের জন্যই সংস্কৃতি। অকল্যাণকর কিছু ঘটলে সে সংস্কৃতির হয় আমূল সংস্কার হোক, নয় তা ছুঁড়ে ফেলা হোক আবর্জনায়। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সংস্কৃতিই পুরোনো হয়ে পচে গলে মরে গেছে। মানুষ এগিয়ে গেছে সামনে।

নারীর অধিকার এবং বহুসংস্কৃতির সমাজকে একই সঙ্গে কি করে টিকিয়ে রাখা যায়, তা নিয়ে লেখক প্রচুর কথা বলেছেন। আমার বক্তব্য হল, যে করেই হোক অধিকার টিকিয়ে রাখতে হবে, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি সংস্কৃতি চলতে পারে ভালো, তা নয়তো পিছিয়ে পড়বে। পড়ুক। নারীর প্রধান ও প্রথম *দায়িত্ব* নারীর *অধিকার*কে বাঁচিয়ে রাখা।

বইটিতে ভাষা ভালো না হলেও বিষয় ভালো। বইটি শেষ পর্যন্ত ভালো বই। মূল্যবান বই। বইটি ভুলে যাওয়া ইতিহাস। চরম সত্যের মুখোমুখি পাঠককে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে রাখে বইটি। বইটি ভাবায়। কিছু একটা করার প্রেরণা জাগায়।